শহীদ কাদরী বললেন : ‘দুর, লিখে কী হবে!’

মুহম্মদ জুবায়ের

১.

জ্যামাইকা। না, ভ্রমণবিলাসীদের তীর্থস্থান ক্যারিবীয় দ্বীপ জ্যামাইকা নয়। এখানে উন্মুক্ত সমুদ্রতট ও তার বালুকারাশি, সমুদ্রের বিস্তার ও উদার নীল আকাশ নেই। এই জ্যামাইকা ইট ও কংক্রিটের অরণ্য নিউ ইয়র্ক শহরের একটি অঞ্চল। এই জ্যামাইকা আকাশ আড়াল-করা উঁচু দালানকোঠায় পরিপূর্ণ, পথ আকীর্ণ ছুটন্ত জন ও যানে। এখানে পারসন্স বুলেভার্ড-এর বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের একটিতে বসত করেন বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবি। জীবনযাপনে এবং মননে নাগরিক তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক মধ্যভাগে ১৯৪২-এ জন্ম কলকাতায়, অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তম নগরীতে। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় আসা ১৯৫২ সালে, বয়স তখন দশ। আজন্ম নগরের বাসিন্দা আমাদের এই কবির নাম যদি হয় শহীদ কাদরী, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কসমোপলিটন নগরী নিউ ইয়র্কে এক হিসেবে তাঁকে খুবই মানিয়ে যায় :

আমি করাত-কলের শব্দ শুনে মানুষ।
আমি জুতোর ভেতর, মোজার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া মানুষ ...। (এবার আমি)

এক সাক্ষাৎকারে কবি এই বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন : “... আপাদমস্তক শহুরে আমার কবিতা। আমার দুর্ভাগ্য এই যে গ্রামবাংলার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। ... জীবনানন্দ বা জসীমউদ্দিনের অথবা ‘পথের পাঁচালী’-র যে গ্রামবাংলা, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার কোনও অবকাশ আমার জীবনে আসেনি।”

পুরোদস্তুর নাগরিক হলেও যে ভাষায় তাঁর কবিতা লেখা, যে অঞ্চলের মাটি, আবহ ও পরিবেশে তাঁর বেড়ে ওঠা, যে সাহিত্য-ঐতিহ্যে তাঁর ‘উত্তরাধিকার’ (এটি যে শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম, তাতে আর আশ্চর্যের কি!), সেই কবিকে নিঃসঙ্গ পরবাসে মানতে মন চায় না। অথচ প্রথম কাব্যগ্রন্থে কিন্তু তাঁর ঘোষণা ছিলো একেবারে বিপরীত:

... মানুষের বাসনার মতো ঊর্ধ্বগামী
স্কাইক্রেপারের কাতার –
কিন্তু তবু
চুরুট ধরিয়ে মুখে
তিন বোতামের চেক-কাটা ব্রাউনরঙা সুট প’রে,
বাতাসে উড়িয়ে টাই
ব্রিফকেস হাতে ‘গুডবাই’ বলে দাঁড়াবো না
টিকিট কেনার কাউন্টারে কোনোদিন –
ভুলেও যাবো না আমি এয়ারপোর্টের দিকে
দৌড়ুতে দৌড়ুতে, জানি, ধরবো না
মেঘ-ছোঁয়া ভিন্নদেশগামী কোনো প্লেন।” (একুশের স্বীকারোক্তি)

মানুষের জীবন অবশ্য এইসব প্রতিজ্ঞা বা ছক মেনে চলে না। চারপাশের পরিচিত পৃথিবী ও পরিবেশ বদলায়, মানুষ পরিবর্তিত হয়, বদলে যায় রাজনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা, জীবন-বাস্তবতার বাধ্যবাধকতা একজন মানুষকে বদলে দেয়। গতকালের মানুষটি তখন অন্য জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করে। একজন কবিও তার ব্যতিক্রম হন না। পার্থক্য অবশ্য একটি থাকে। সাধারণ মানুষদের জীবনে এই ধরনের পরিবর্তনের পেছনে সচরাচর থাকে একটি মোটা দাগের গল্প। কবিরা অতি সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ, তাঁদের গল্পটি সবসময় জানাও যায় না। আপাত-সুখী কোনো গৃহস্থের অকস্মাৎ আত্মহণের মতোই তা অনিশ্চিত রহস্যে আবৃত থাকে।

২.

প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধানে শহীদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের এক সন্ধ্যায়। তাঁর নিউ ইয়র্কের বাসস্থানে। বস্তুত এই চার দেয়ালের বাইরে তাঁর বড়ো একটা যাওয়া হয় না চলৎশক্তি সীমিত বলে। যা-ও হয়, কিছু সামাজিকতার বাধ্যবাধকতা বাদ দিলে, তার বেশির ভাগই চিকিৎসা ও চিকিৎসকঘটিত। এর বাইরে বিভিন্ন উপলক্ষে-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হয় তাঁকে। এড়াতে চান প্রণপণে, তবু সবসময় সফল হন না। উদ্যোক্তারা হয়তো ভালোবেসেই তাঁকে ডাকেন, কিন্তু ভালোবাসাও কখনো কখনো যন্ত্রণাদায়ক হয়।

শহীদ কাদরীর শারীরিক সমস্যা অনেকগুলি, তার মধ্যে প্রধানতম হলো, তাঁর কিডনি অকেজো। কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্যে নাম লিখিয়ে অপেক্ষায় আছেন বছর চারেক। যে কোনোদিন ডাক আসতে পারে, এলে চার ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে উপস্থিত হতে হবে। ফলে, শহরের বাইরে কোথাও যাওয়ার সুযোগও নেই। তার ওপরে সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালিসিস করাতে হয়। ২০০১ থেকে শুরু হয়েছে। হাসপাতালের লোকজন এসে দুপুরে বাসা থেকে তাঁকে তুলে নেয়, ডায়ালিসিস-এর পরে নামিয়ে দিয়ে যায় সন্ধ্যায়।

ভুক্তভোগীরা জানেন, কী কষ্টদায়ক এই চিকিৎসা প্রক্রিয়া। ঘরে ফিরে আসতে হয় যন্ত্রণায় কাতর প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায়, শরীর-মন তখন সম্পূর্ণ বিস্রস্ত ও বিধ্বস্ত। ডায়ালিসিস-এর ধকল কাটতে লেগে যায় পুরো একটা দিন, ততোক্ষণে আরেকবার যাওয়ার প্রায় সময় হয়ে আসছে। কিন্তু উপায় কি, জীবনরক্ষার জন্যে আপাতত এর বাইরে আর কোনো ব্যবস্থা নেই। কবির একমাত্র যুবক পুত্র নিজের একটি কিডনি দিতে ইচ্ছুক পিতার এই দুর্বিসহ যন্ত্রণার উপশমের জন্যে। কিন্তু পিতা প্রবল অনিচ্ছুক। শহীদ ভাই ছেলেকে বলে দিয়েছেন, আমার এই জীবনের আর কী মূল্য আছে? তোমার সামনে একটি সম্পূর্ণ জীবন, আমার জন্যে তোমার অঙ্গহানি আমি ঘটাতে পারি না।

পুত্রকে বলা এই সিদ্ধান্ত শহীদ কাদরীর কবিতার মতোই স্পষ্ট ও ঋজু। দিনের পর দিন শারীরিক যন্ত্রণার সম্ভাব্য উপশম প্রত্যাখ্যান করতে দরকার হয় সন্তপুরুষের সাহস ও সহিষ্ণুতা।

৩.

‘না, শহীদ সে তো নেই; গোধূলিতে তাকে
কখনও বাসায় কেউ কোনদিন পায়নি, পাবে না।

... ...
সভয়ে দরোজা খুলি – এইভাবে দেখা পাই তার – মাঝরাতে;
জানি না কোথায় যায়, কি করে, কেমন করে দিনরাত কাটে
... ...
না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকাল বেলায় সে তো – শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।' (অগ্রজের উত্তর)

ষাট দশকের পুরোটা এবং সত্তর দশকের শেষে দেশত্যাগ করার আগে পর্যন্ত এই ছিলেন শহীদ কাদরী। ঢাকায় বিউটি বোর্ডিং ও রেক্স-এর, বা আর কোথায় নয়, সাহিত্যঘটিত আড্ডায় অপরিহার্য একজন হিসেবে তাঁর খ্যাতি প্রবাদতুল্য। এইসব ঠেক-এ বন্ধুদের সঙ্গে দিনমান হৈ-হুল্লোড়ে সময় কাটে। যেন এই-ই জীবনের একমাত্র ব্রত ও করণীয়। মাঝেমধ্যে একটি-দুটি কবিতা রচনা। তা-ও, তাঁর নিজের ভাষায়, অনেকটা খেলাচ্ছলে। নিজেই একদিন বলছিলেন, খসড়া খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আল মাহমুদ আমার অনেক কবিতা ছেপে দিয়েছে এখানে-ওখানে। করেছিলো বন্ধুত্বের টানেই।

এক অর্থে 'শহীদ কাদরী বাড়ি নেই' তো সেই কবে থেকে! গুনে গুনে ২৮ বছর। দেশ ছাড়া আর বাড়ি ছাড়া তো পৃথক কোনো অর্থ বহন করে না, বিশেষত একজন সৃষ্টিশীল লেখকের জন্যে। সব ছেড়েছুড়ে – অগণন বন্ধুবান্ধব, প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ, মেধাবী কবি হিসেবে খ্যাতি ও স্বীকৃতি – দেশের বাইরে উড়াল দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড-জার্মানি পেরিয়ে আমেরিকায়, বস্টন হয়ে নিউ ইয়র্ক।

অথচ আজ এই পরবাসে 'শহীদ কাদরী বাড়ি নেই' আর বলবে কে? তিনি এখন বাড়িতেই থাকেন, দিন কাটে এ-ঘরে ও-ঘরে শুয়ে-বসে। স্ত্রী কর্মক্ষেত্রে, হাতের কাছে সেলফোনসহ দুটি ফোন, জরুরি দরকার হলে যেন খবর দেওয়া যায়। আর থাকে বাংলা-ইংরেজি বই ও পত্রপত্রিকা। শরীর অনুমোদন করলে পড়েন। না হলে শুয়ে থাকেন একা বিছানায়, সিগারেট বা পাইপ সেবন করেন। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, ধূমপান বা গোমাংস ত্যাগ না করার পরামর্শ চিকিৎসকরাই দিয়েছেন তাঁর শরীরঘটিত জটিলতা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে। গৃহের বাইরে একমাত্র গন্তব্য হাসপাতাল, যন্ত্রণার অফুরান সরবরাহকারী। রাতে ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম নেই।

... এইমতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা ...
আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত জবার মতো
বিপদ-সংকেত জ্বেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে
পড়ে আছি মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো
অনিদ্রায়। (উত্তরাধিকার)

এই অপরিসীম নিঃসঙ্গতা ও রোগযন্ত্রণা সহনীয় হয় নীরা ভাবীর কারণে। শহীদ ভাইয়ের জীবনে এখন তিনি শুধু স্ত্রী নন, ধৈর্য ও যত্নের প্রতিমূর্তি। যেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে নেমে আসা মমতাময়ী এক নারীচরিত্র তিনি।

৪.

নিউ ইয়র্কে তাঁর গৃহে পৌঁছে দেখা গেলো, বসার ঘরে সোফায় বসে আছেন তিনি। কফি টেবিলের ওপরে, নিচে ও পাশে বইপত্রের স্তূপ। সামনে টিভি, তার পর্দা নির্বাপিত। কিছুটা যেন ম্রিয়মাণ ও বিষণ্ন তিনি। শরীর ভেঙেছে, কিছু ক্ষীণকায়, মাথায় চুল কমে গেছে। চোখে চিরচেনা সেই চশমা দেখি না, সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। আগের দিন ডায়ালিসিস থেকে ফিরেছেন, তার রেশ হয়তো তখনো কাটেনি, কাল আবার যেতে হবে। যে শহীদ ভাইকে সর্বশেষ দেখেছি ঢাকায়, তিনি এই শহীদ ভাই নন। হাসলেন, সেই গমগমে স্বরের হা হা হাসি নয়। কথা বললেন, তাতে উচ্ছ্বাস ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য নেই। বয়স মানুষকে বদলায়, তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই, রোগের আক্রমণ তো একেবারে ভেঙেচুরে দেয়। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আমার ছিলো না, তিনি নিউ ইয়র্কে আসার পর থেকে মাঝেমধ্যে ফোনে কথা হয়। তখন প্রায়ই তাঁকে কথাবার্তায় আগের মতোই শোনায়, দৃঢ় জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, পরিহাসপ্রিয়। স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অটুট, বহুকাল আগে পড়া কবিতার পংক্তি বা গদ্যের উদ্ধৃতি অনায়াসে দিয়ে যান বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায়।

মনে পড়ে, শহীদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়, কী আশ্চর্য, তাঁর রোগশয্যাতেই। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পিঠের ব্যথায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সেই ক্যাবিনে দর্শনার্থীর আনাগোনার শেষ নেই, যেন তিনি নিজে যেতে পারছেন না বলে রেক্স-কেই উঠে এসে জায়গা করে নিতে হয়েছে হাসপাতালের কক্ষে। ঠিক মনে নেই কার সঙ্গে গিয়েছিলাম সেখানে, তবে হাসপাতালে কোনো রোগীকে অতো উচ্চকণ্ঠে হাসতে আমি কখনো দেখিনি। মনে না থেকে উপায় আছে?

এর কিছুকাল পরে আজিমপুর এলাকায় ছোটো একটি ট্রেডল মেশিন নিয়ে 'ত্রিকাল' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন কবির যৌথ মালিকানা এই ছাপাখানার। শহীদ ভাই ত্রিকালের একজন, বাকি দুই কাল আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান। ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন-তেমন, ধুম আড্ডা চলে সেখানে। শহীদ ভাইয়ের মতো আড্ডাধারী মজুত থাকলে এর বাইরে কিছু হওয়া একরকম অসম্ভবই। আমার আবাস তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল। আড্ডার টানে প্রায়ই যাওয়া হয় ক্ষুদ্রপরিসর সেই ছাপাখানায়, পকেটে রিকশাভাড়া না থাকলে হেঁটে যেতেও অসুবিধা নেই। প্রচুর ডালপুরি-চা-সিগারেট উড়ে গেছে, ছাপাখানার আয় এবং ব্যয় সম্ভবত সমান করে দিয়ে। ক্রমে ব্যয়টিই বেশি ওজনদার হয়। ব্যবসাবুদ্ধির জন্যে কবিদের খ্যাতি কোনোকালে ছিলো না, এই তিন কবির 'ত্রিকাল'-ও বেশিকাল টেকেনি।

৫.

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও আমার পিতা রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী কবিতার অনুরাগী ছিলেন না। তাঁর ভাষায় 'আধুনিক কবিতা' দুরূহ ও দুর্বোধ্য। তবু কোন রহস্যবলে কে জানে, ষাটের দশকের শেষদিকে দুটি কবিতার বই আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয় – শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা' এবং শহীদ কাদরীর 'উত্তরাধিকার'। তখন আমি স্কুলে পড়ি। 'উত্তরাধিকার' বইটি সাধারণ বইয়ের আকারের চেয়ে আলাদা ছিলো মনে আছে। প্রকাশক চট্টগ্রামের 'বইঘর'। বইটি পড়ার চেষ্টা করেছিলাম কি না, মনে নেই। করলেও কিছু বুঝেছিলাম, এমন দাবি করতে পারি না। আমাদের বগুড়ার বাড়িতে এই বইয়ের কপিটি এখনো থাকার কথা। বইটির কথা মনে পড়লো শহীদ ভাইয়ের বাসা থেকে ফিরে আসার পথে।

শহীদ কাদরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা' প্রকাশিত হলো স্বাধীনতার পরে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন ছাত্র আমি, এই প্রথম মুগ্ধ হয়ে শহীদ কাদরী পড়া। অনেকগুলো কবিতা মুখস্থ হয়ে গেলো। তখন পড়া হলো 'উত্তরাধিকার'। তখনো তিনি দূরের মানুষ, চাক্ষুষ দেখিনি। শেষ গ্রন্থ 'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'। ক্রন্দন তো আসলে ছিলো, তা কবিরই, গ্রন্থের শিরোনামে সেই সঙ্গোপন ক্রন্দনের ঘোষণা। এটি প্রকাশিত হলো ১৯৭৮-এ, তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ অনিয়মিত। তিনি যে দেশে নেই, তা-ও জেনেছি বিলম্বে।

পরবাসী হওয়া বিষয়ে গত বছর কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি কাগজে সাক্ষাৎকারে তাঁর ব্যাখ্যাটি এরকম : "নানান ব্যক্তিগত কারণে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় দেশত্যাগ করেছিলাম। লেখকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ইত্যাদির ফলে এমনই বিবমিষা আমাকে দখল করেছিলো যে শুধুমাত্র স্বস্তি ও শান্তির জন্য শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে সব ধরনের সংযোগ ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিই। ... নিজেকে নির্বাসিত না বললেও পলাতক বলা যেতে পারে। পরশ্রীকাতর, পরচর্চালিপ্ত, রন্ধ্রসন্ধানী আমার চেনা ভুখণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

গল্পটি চেনা চেনা কি লাগে না? এই কাহিনী আজও সাম্প্রতিক ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

তাঁর রচনার সংখ্যা বেশি নয়। তিনটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ। আর আছে ছড়ানো অগ্রন্থিত কিছু কবিতা, তারাও সংখ্যায় বড়ো নয়। তাঁর নিজের জবানীতেও সেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যাচ্ছে : "আমার ধারণায় আমি সত্যি খুব কম লিখেছি। এবং এও সত্যি যে আমার তৃতীয় গ্রন্থ বেরুবার পর আমার মনে হয়েছিল যে আমার আর কিছু বলার নেই। উপরন্তু প্রবাসে আসার পর, দেশের সঙ্গে সম্পর্করহিত অবস্থায়, আমার মন নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল। এবং এখনও আমার মানসে নতুন কোনো কথা জোগায় না।"

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে কী হলো তাহলে পরবাসে এসে? একদা তিনি নিজেই লিখেছিলেন :

আমার মত ভীরু সাঁতার-না-জানা লোক
পার হলো নদী –
এটাই নিয়তি।
অন্যরকম পরিণামও যে দেখিনি এমন নয়
– সাঁতারু জাঁদরেল ক্যাপটেন এক জাহাজসুদ্ধ ডুবে গেল
– উর্ধ্বাকাশ থেকে বোয়িং-৭০৭ অজগ্রামে পুকুরে তলালো
কিন্তু নদী পার হয়ে আমি গন্তব্যে পৌঁছুলাম? *(গাধা-টুপি প'রে)*

এ কথা সত্যি যে, পরবাসী হওয়ার পর তাঁর লেখালেখি আশংকাজনকভাবে কম। তবু এর মধ্যেও উজ্জ্বল কিছু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। আমার জানামতে তাঁর প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা যাক :

যাচ্ছি কোথায়, কেউ জানে না,
পাগলা হাওয়া বাধ মানে না,
রাতের কালো জলে আমার
কথা ছিল একটু থামার।

… … … … … … … … … …
একা-একা একলা অন্ধকারে
ক্ষান্তিবিহীন চলছে নৌকা বাওয়া,
তবুও আজ তিনপুরুষের বসতবাটির দাওয়া …
মাঝে মাঝে বলছে হেঁকে –
এ তোমার কেমন চলে যাওয়া,
এ তোমার কেমন চলে যাওয়া। (যাত্রা)

শহীদ কাদরীর কাব্যবিচারের ক্ষমতা আমার নেই। শুধু জানি, আমি তাঁর মুগ্ধ পাঠক। অগাস্টের ১৪ তারিখে গেলো কবির জন্মদিন। রচনাটি লেখা হলো সেই উপলক্ষে।

৬.

প্রতিবার ফোনে কথা বলার সময় শহীদ ভাইকে নতুন কিছু লিখছেন কি না জিজ্ঞেস করি, অনেকটা নিয়ম করেই। বেশিরভাগ সময় জবাব আসে, ভাবছি।

সাক্ষাতের সময়ও জিজ্ঞেস করলাম। হাত তুলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, দুর, লিখে কী হবে?

জানি, শরীর সক্ষম না থাকলে লেখালেখির চিন্তা মাথায় এলেও লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। নীরা ভাবীও পরে জানালেন, একটু ভালো থাকলে হয়তো কিছু একটা লেখার কথা ভাবে। কিন্তু পরদিন যখন ডায়ালিসিস থেকে ফিরে আসে, তখন সেই ভাবনা কোথায় হারিয়ে যায়। শরীরের যন্ত্রণা আর সবকিছুকে ঢেকে ফেলে।

দুর লিখে কী হবে-র উত্তরে বলি, তা তো বুঝলাম শহীদ ভাই। কিন্তু বলতে পারেন, না লিখে কী হবে? সারাজীবন তো লিখতেই চেয়েছেন, তাই না?

কবি নিরুত্তর থাকেন। তিনি কি সম্মতি জানালেন? আমরা অপেক্ষায় থাকবো।